Android Coding Bd

প্রথম অধ্যায়
দেশ ও জনগোষ্ঠির পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন লিখেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', তখন তার মনে ছিলো আবহমান বাংলার রূপ। আর ঐ সময় সে-বাংলার সীমানা ছিলো দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে তরাই। সেই ভৌগোলিক সীমানার বাংলা তো আর এখন নেই, প্রাচীনকালের মতোই আবার তা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ করে ইংরেজরা এক ভাগ (পশ্চিমবঙ্গ যার নাম) দিয়েছিলো ভারতকে, আরেক ভাগ (পূর্ববঙ্গ) পাকিস্তানকে। পাকিস্তানের ভাগে পড়া পূর্ববঙ্গ তারপর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পরিণত হয়েছিলো স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র-বাংলাদেশ-এ। কিন্তু এখনো আমরা যখন 'বাংলা' শব্দটি উচ্চারণ করি তখন আবহমান বাংলার রূপই ভেসে ওঠে আমাদের সামনে।

আবহমান যে-বাংলার কথা ভাবি আমরা, সময় সময় তার ভৌগোলিক সীমারেখাও কিন্তু বিভিন্ন সময় ছিলো বিভিন্ন রকম। প্রাচীন আমলে সেই বাংলা বিভক্ত ছিল সমতট, হরিকেল, তাম্রলিপ্তি, বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র প্রভৃতি রাষ্ট্রে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদের মধ্যে 'বঙ্গ' ও 'বাঙাল' ছিলো মাত্র দু'টি জনপদ। কিন্তু এ-দু'টি নাম থেকেই 'বর্তমান এবং মধ্যযুগীয় সমগ্র বাঙলাদেশ' নামটির উৎপত্তি। গৌড় নামের অধীনে যদিও বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন শশাংক (আনুমানিক ৬০৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের অধিপতি হয়েছিলেন তিনি) এবং পাল ও সেন রাজারা সে-চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা সফল হয়নি। 'সে সৌভাগ্য ঘটিল বঙ্গ নামের'। তবে তা পরিণতি লাভ করেছিলো আকবরের (১৫৫৬-১৬০৬) সময়, যখন সমগ্র বাংলা, 'সুবা বাংলা' নামে পরিচিত হয়েছিলো।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল দ্বারা শাসিত হতো। লেফটেনান্ট গভর্নরের অধীনে নতুন বাংলা প্রদেশের সূচনা করেছিলেন লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬), ১৮৫৪ সালে। বাংলা প্রদেশের উপবিভাগগুলো ছিলো– বেঙ্গল প্রপার, বিহার, উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুর। ঐ সময় বাংলা প্রদেশের ভৌগোলিক সীমানা ছিলো উত্তরে 'হিমালয় পর্বত শ্রেণী, পর্বতের উপত্যকায় নেপাল, ভুটান আর সিকিম রাজ্য, দক্ষিণে গর্জনমুখর বঙ্গোপসাগর, উপকূলে নোয়াখালী চট্টগ্রামের শ্যামল বন মেঘলা, পূর্বে আসাম গারো খাসিয়া জয়ান্তিয়া পাহাড়ের ধূসর দেয়াল আর পশ্চিমে বিহার আর উড়িষ্যার বনভূমি। এই ছিলো ইংরেজ আমলের বাঙলা, ৫টা বিভাগে ভাগ করা ২৮টা জেলার বাঙলা।'

১৮৭০ সালে বাংলা থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং সংশ্লিষ্ট পর্বত, কাছাড় ও সিলেট

Android Coding Bd

আলাদা করে নিয়ে গঠন করা হয়েছিলো নতুন প্রদেশ আসাম। নতুন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন চিফ কমিশনার। ১৮৯৮ সালে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিলো দক্ষিণ লুসাই পর্বত। ১৯০৫ সালে, মোটামুটি আজকের বাংলাদেশ ও আসাম নিয়ে গঠিত হয়েছিলো আবার পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। পাকিস্তান আমলেও ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ পরিচিত ছিলো পূর্ববঙ্গ নামে (তারপর পূর্ব পাকিস্তান নামে), ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তা পরিণত হলো স্বাধীন বাংলাদেশে।

গোপাল হালদার সম্পাদিত *সোনার বাঙলা* গ্রন্থে সুন্দর একটি কথা আছে– "মানুষ মমতা দিয়ে গড়ে তার দেশকে আর দেশ আবার গড়ে সেই মানুষকে। মানুষ আর মাটির এই দেওয়া নেওয়া টানা পোড়েনেই রচিত হয় জাতির পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-ইতিহাস–তার সাফল্যের দীপ্তি আর ব্যর্থতার কালিমা।"

বাংলাকে মমতা দিয়ে গড়েছে বাঙালি। প্রাচীনকালে যারা বাস করতেন এ ভূখণ্ডে তারা 'ভাষা আর সংস্কৃতির' বিশেষ ঐক্যবন্ধনে বিজড়িত 'বাঙালি' পরিচয় নিয়ে তখনও আত্মপ্রকাশ করেননি। এই 'ঐক্য বন্ধন'-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো মধ্যযুগে।

প্রাচীন বাংলা ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, একটি বিশেষ প্রাকৃতিক সীমার আবেষ্টনীর মধ্যেই জাতি ও ভাষার বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে এবং "এই জন ও ভাষার একত্ব বৈশিষ্ট্য লইয়াই বর্তমান বাঙলাদেশ এবং সেই দেশ চতুর্দিকে বিশিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা বেষ্টিত। বর্তমান রাষ্ট্রসীমা এই প্রাকৃতিক ইঙ্গিত অনুসরণ করে নাই সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিককে সেই ইঙ্গিতই মানিয়া চলিতে হয়, তাহাই ইতিহাসের নির্দেশ।"

পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠির মানসিকতা তৈরি হয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক প্রভাবের ফলে। পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নদী, নৌকা, সবুজ গাছগাছালি আর দিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি। এই নিসর্গ বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রভাবিত করেছে পূর্ববঙ্গের মানুষের মন ও জীবনকে তাই নীচে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বা যে কোন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলেই প্রথমেই নদী কথা আসবে। আবহাওয়া পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক কারণে অনেক নদী মরে গেছে কিন্তু যা আছে তা এখনও আমাদের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণায়ক।

জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছিলেন, 'বাঙলার ইতিহাস এক হিসেবে বাঙলার নদীর ইতিহাস।' কথাটা মিথ্যে নয়। নদী বাঙালির প্রাণ, সব সময় সে থাকতে চেয়েছে নদীর কাছে, ভালোবেসে নদীর নাম দিয়েছে মধুমতি, ইছামতি, দুধকুমার, কপোতাক্ষ, কর্ণফুলি বা বাঙালি। আমাদের শরীরের যেমন শিরা উপশিরা এ-দেশে নদীও তেমনি। নদী আমাদের মনে কিভাবে বহতা তা বোঝা যাবে সে-সব সাহিত্যিকদের রচনায় যাঁদের জন্ম পূর্ববঙ্গে। নদী তাঁদের রচনায় কোনো না কোনো ভাবে এসেছে ঘুরে ফিরে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' বা অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। নদী কিভাবে পূর্ববঙ্গ-বাসীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করে তার একটি চিত্র পাওয়া

Android Coding Bd

যাবে এ-উপন্যাস দু'টিতে। আর কবিতা? এক জীবনানন্দ দাশের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

বিজ্ঞানীদের মতে, নদীর ব প্রদেশের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উত্থানপতন। এবং "নদীর গতি হ্রাস, বৃদ্ধি বা পরিবর্তন এবং ব প্রদেশের উত্থান পতনের সঙ্গে বাঙালার বাণিজ্য, রাষ্ট্র ও কৃষ্টির বিশেষ সম্পর্ক।"

তাই দেখি বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশের নদী ও অঞ্চলকে এবং এর মানুষকে গড়েছে, ভেঙ্গেছে। তলিয়ে গেছে নদীর জলে অনেক লোকালয়, কীর্তি। এ-কারণেই বোধ হয় বাংলার মানুষ নদীর আরেক নাম দিয়েছে ভাঙ্গাগড়া দেখে একবার অবাক হয়ে লিখেছিলেন, "যেখানে সরোবর দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন সমভূমি, যেখানে গ্রাম দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন নদী-গর্ভস্থ অমল ধবল সৈকত ভূমি।"

বাংলাদেশের নদীপ্রবাহ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। আমাজান প্রবাহের পরই, মোট প্রবাহের পরিমাণের দিক থেকে পদ্মা-মেঘনার স্থান। এছাড়া বাংলাদেশে মাকড়শার জালের মত নদীনালা খালের দৈর্ঘ্য হবে কমপক্ষে পনের হাজার মাইল। এর মাঝে আছে খরস্রোতা, পার্বত্য নদী, শান্ত ক্ষীণকায়া উপনদী বা পদ্মা-মেঘনার মত উত্তাল নদী।

বাংলাদেশের নদী সংস্থানকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–

১. গঙ্গা বা পদ্মা এবং এর বদ্বীপ
২. মেঘনা এবং সুরমা প্রবাহ
৩. ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা
৪. উত্তরবঙ্গের নদীসমূহ
৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সংশ্লিষ্ট সমতলভূমি নদী।

প্রতিটি নদী পূর্ব বা দক্ষিণ প্রবাহিনী। আর যে সময়টিতে নৌকা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সে সময় বায়ু প্রবাহিত হয় পূর্ব এবং দক্ষিণে। সুতরাং বিনা আয়াসে বা পাল তুলে নৌকা চলতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি-প্রদত্ত এ-সুবিধা না থাকলে বর্ষার দুকূল ছাপানো যমুনা বা মেঘনার নৌকা বাওয়াই মুশকিল হয়ে উঠতো, বন্ধ হয়ে যেতো নৌপথের সব ব্যবসা-বাণিজ্য।

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার অভাবে বাংলার বিভিন্ন প্রদেশের বা অঞ্চলের সীমারেখা নির্ণয় করতো এই নদী। সুতরাং নদীর প্রবাহ বদলে গেলে সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে তা প্রভাব বিস্তার করতো। এ-পরিপ্রেক্ষিতে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে-হিউয়েন সাং (৬৩০-৪৩ খ্রীঃ) যখন বাংলায় এসেছিলেন তখন করতোয়া ছিলো এক বিশাল নদী বা পুন্ড্রবর্ধনকে (উত্তরবঙ্গ) আলাদা করে রেখেছিল কামরূপ (আসাম) থেকে। পরবর্তীকালে এ-প্রবাহ মরে গিয়েছিলো এবং যমুনা হয়ে উঠেছিলো উত্তরবঙ্গ ও আসামের সীমানা।

পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে নদী। নদী জল-নিঃসারক, জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক, মৎস্যের আধার, সস্তা ও সহজ জলপথ। এ প্রসঙ্গে রেনেলের (১৭৮১) উক্তি স্মতর্ব্য– "বাংলার নদনদী কমপক্ষে তিরিশ হাজার মাঝির অন্ন

যোগাচ্ছিলো।"

Android Coding Bd

বাংলাদেশের নদীগুলোর প্রধান কাজ ভূমি নির্মাণ করা। কখনো কখনো কয়েকটি নদী একত্রিত হয়ে এ-কাজ শুরু করে। বহতা নদীর পলি সম্পূর্ণ করে ভূমির পরিবর্তন। তারপর এক জায়গায় কাজ শেষ হলে হয়তো দেখা যায় নদী মজে যাচ্ছে। তখন অন্যদিকে ঠিক একইভাবে কাজ শুরু হয়। নদী যে দিকে বয়ে যায় তার দুকূলে লোকে বসতি স্থাপন করে। নদী মরে গেলে খাত থেকে যায়, বসতিও হয়ত থাকে নয়ত নতুন প্রবাহের পাশে আবার স্থাপিত হয় বসতি। কিন্তু বাংলার সব নদনদীই পরিবর্তনশীল। একটি উদাহরণ দেয়া যাক–১৭৬৫ থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত রেনেল উত্তর এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গের নদীগুলো জরীপ করে এক মানচিত্র প্রণয়ন করেছিলেন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর পর বুকানন হ্যামিলটন (১৮০৯) সে একই পথ পরিভ্রমণ করতে গিয়ে দেখেছিলেন, পুরনো প্রবাহ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।

নদীর প্রবাহ বা খাত পরিবর্তন জনজীবনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। খাত পরিবর্তনের অর্থ বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের রূপান্তর শ্রীহীন অঞ্চলে। প্রাচীনকাল থেকেই এ রকমটি হয়ে আসছে। এক সময়, গঙ্গা যখন মেদিনীপুর অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হতো তখন তাম্রলিপ্ত বা তমলুক হয়ে উঠেছিলো পূর্বভারতের প্রধান বন্দর, সমৃদ্ধিশালী এক অঞ্চল।

সপ্তগ্রামও ছিল মধ্যযুগের একটি নামী বন্দর। কিন্তু নদী মজে যেতে থাকলে সপ্তগ্রামও পরিণত হয়েছিলো শ্রীহীন অঞ্চলে। সতের শতকে রূপনারায়ণ পড়েছিলো নির্জীব হয়ে কিন্তু অন্যদিকে জেগে উঠেছিলো গড়াই, জরাঙ্গী আর মাথাভাঙ্গা। আঠারো শতকে প্রবল হয়ে উঠেছিলো তিস্তা, যমুনা এবং কীর্তিনাশা। "আজ ছ'শো বছর ধরে গঙ্গা নদী চলছে পূর্ব দিকে বয়ে–পুরনো বন্দর, শহর আর গ্রাম হয়েছে প্রাণহীন, এসেছে ধ্বংস আর পরিবর্তন।"

শুধু প্রকৃতিগত কারণেই নয়, অনেক সময় বাঁধ দেওয়ার ফলে বা অন্য কোনো কারণে নদীর প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হলে নদীর খাত শুকিয়ে যায়। শস্য-শ্যামলা স্থান হয়ে ওঠে রুক্ষ। যেমন বাগেরহাটের কাছে খাল কাটার ফলে ভৈরব নদী গিয়েছিলো ভরাট হয়ে। এ-ছাড়া উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ববঙ্গে যখন রেলওয়ের বিস্তার হচ্ছিলো, তখন রেল লাইন বসাবার জন্যে বাঁধ দিতে হয়েছিলো অনেক জায়গায়, ফলে তা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলো অনেক নদী প্রবাহে। পশ্চিম এবং দক্ষিণের নদীগুলোর অহরহ পরিবর্তন এবং মৃতাবস্থার ফলে ঐ সব অঞ্চলে হ্রাস পেয়েছিলো কৃষি উৎপাদন ও জনসংখ্যা এবং হানি ঘটেছিলো জনস্বার্থের। নদীর ব্যবহারের সঙ্গে কৃষককে খাপ খাইয়ে নিতে হয় ফসল পরিবর্তন করে। যেমন, এসব অঞ্চলে আমন ধান উৎপাদনে নদীর পরিবর্তন বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

নদী যেমন পলিমাটি দিয়ে জমি উর্বর করে তেমনি নদীর খাত সরে গেলে, সেই খাতে পানি জমে হয় বিল। নদীর মাঝে আবার অনেক সময় পলি ভরাট হয়ে সৃষ্টি করে চর বা দিয়াড়ার। সুতরাং নদীর সঙ্গে খালবিল চরের কথা প্রাসঙ্গিক, যার সংখ্যা পূর্ববঙ্গে নেহাৎ কম নয়।

Android Coding Bd

সতীশচন্দ্র (১৯১৪) নদী আর বিলের প্রভেদ ও জনজীবনে এর প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন সুন্দরভাবে। বিলের ভিতরে এবং খানিকটা বাইরে বর্ষার পর বেশ পানি জমে থাকে, সেজন্যে সেখানে ভালো আমন হয়। বর্ষাকালে পানি পেলে হয় আউস এবং কার্তিক অগ্রহায়ণে কলাই, সরিষা প্রভৃতি। ক্ষেতের পাশে কৃষকের বাড়ি, কাছে বিল, তাতে প্রচুর মাছ।

বিলের ধারে বসবাসরত কৃষক মোটামুটি সম্পন্ন। হাটের দিন বাজারে গিয়ে সে, "মাছের গল্প, ভূতের গল্প ও জমির গল্প দ্বারা সে উদর পূর্ণ ছিলো তাহা খালাস করিয়া আসে।" এর পিছে, বড় নদীর কূলে বাস করে সভ্য শিক্ষিত ধনীরা, তারা ভালো খায়, ভালো পরে, দেশ দশের খবর রাখে, ঋণ করে। "নদীর কূলে নিত্য নতুন মুক্ত সভ্যতার স্রোত, আর বদ্ধ বিলের পার্শ্বে সেই অনাড়ম্বর অপরিবর্তনীয় প্রাচীন পদ্ধতি। নদী ও বিলে-বাওড়ে এইটুকু প্রভেদ।"

নদীর যখন কূল ভাঙ্গে তখন বিনষ্ট হয় কৃষিক্ষেত্র, লোকজনকে ত্যাগ করতে হয় অনেক দিনের গড়ে তোলা বসতি। নদীর ভাঙ্গন থেকে উদ্ভব ঘটে চরের, আর চর মানে নতুন জমি, নতুন বসতি। নদীর ভাঙ্গন এবং আবার নতুন আশ্রয়ের খোঁজে পুরনো আশ্রয় ত্যাগ পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে বিস্ময় নয়। নদীর মধ্য ও নিম্নগতির পর্যায়েই চর পড়ে। মধ্যগতিতে দেশের অভ্যন্তর ভাগে এবং নিম্ন গতিতে উপকূলভাগে চরের সৃষ্টি করে। নিম্ন প্রবাহে উর্ধ্বগতি থেকে প্রাপ্তপলি, বালি, কাদা প্রভৃতি মোহনার মুখে নিক্ষেপ করে বিস্তৃত চরাঞ্চলের সৃষ্টি করে। এ-জন্যে বাংলাদেশের উপকূলে চরের সংখ্যা অধিক। বাংলাদেশের সজীব নদী অঞ্চলে এই চর বা দিয়াড়া এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নদীতে চরের বিলুপ্তি কৃষিযোগ্য জমি হ্রাস করে আবার অন্যদিকে নতুন চরের উৎপত্তি সৃষ্টি করে নতুন বসতি, কৃষি এবং বাড়তি জনসংখ্যার আবাস ও মামলা মোকদ্দমার।

নাফিস আহমদ উল্লেখ করেছেন, যমুনা বা ধলেশ্বরী তীরবর্তী ঢাকা ও ময়মনিসংহ জেলার যে-কোনো থানা বা মৌজা এক ঋতুতে নদীর ভাঙ্গনের ফলে হয় কমপক্ষে দুশো থেকে তিনশো একর জমি হারায় অথবা ঐ পরিমাণ জমি (চর হিসেবে) লাভ করে। রেনেলে সময় যা ছিলো চরমাত্র, একশো বছর পর তাই হয়ে উঠেছিলো বরিশালের এক জনবহুল দ্বীপ ভোলা।

জমিই বাঙালির জীবিকার প্রধান নির্ভর এবং তা সীমিত। তাই চর মানেই নতুন জমি। ফলে প্রাচীনকাল থেকে চর নিয়ে বিবাদ বিসংবাদের শেষ নেই। বাংলাদেশে প্রবাদই আছে, 'জোর যার চর তার'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের পূর্ব পর্যন্ত দেখা গেছে, নতুন চরের মালিক হচ্ছে সব সময়ই জমিদার এবং জোতদাররা। অর্থাৎ শক্তিমানরা। এখনও তার তেমন হেরফের হয়নি। এবং এখনও বাংলাদেশে চর দখলের আগে কৃষকরা পরিবার পরিজন থেকে বিদায় নিয়ে যায়। কিন্তু যারা চরের জন্যে প্রাণ দেয় চর তাদের ভোগে আসেনা বললেই চলে। সে জমি চলে যায় ধনী কৃষক বা জোতদারের দখলে। 'বিচিত্রা'র এক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে গত পনেরো বছর বাংলাদেশের চরাঞ্চলে সংঘর্ষে মৃত্যুবরণ করেছেন প্রায় পনেরো হাজার লোক।

Android Coding Bd

চরে যারা বাস করে তাদের চরিত্র সমতলভূমির লোক থেকে একটু আলাদা। কারণ চর অহরহ ভাঙ্গে গড়ে। তাই চরের জীবন অস্থির। প্রকৃতির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম এদের করে তোলে সাহসী এবং সংগ্রামী। এইভাবে অনবরত লড়াই করতে হয় বলে এরা হয়ে ওঠে, 'সরল, উদার সংঘবদ্ধ ও বহির্মুখী।' অন্যদিকে সমতল ভূমির মানুষ চরবাসীর তুলনায় খানিকটা নমিত এবং ততোটা বর্হিমুখী নয়।

সেজন্য, বাঙালির প্রধান সমস্যা 'জলের সঙ্গে স্থলের বিপ্লব।' বাংলাদেশের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল নদীর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের ওপর। তবে নদীর চরিত্র বাঙালিকে যেমন করেছে উদার বিরাগী তেমনি করেছে সংগ্রামী। "নদীর মৃত্যু বা গতি পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙালির মনের গূঢ় সম্পর্ক আছে। নদীই এনেছে অনেক সময় তার সমাজে ক্রান্তি, তার মনকে করেছে সচেতন ও দুঃসাহসী। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তার উদ্ভাবনী শক্তিকে প্রখর..." লিখেছেন প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। এ প্রসঙ্গে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যও স্মর্তব্য, "নদী যেখানে কীর্তিনাশা মানুষ সেখানে নিত্য নতুন কীর্তি অর্জন করে। তাই কোনো কীর্তিনাশা বাংলার নিজস্ব কীর্তিকে নষ্ট করিতে পারে নাই।... বার ভূঁইয়াদেরও স্বাধীনতা প্রিয়তাকে উদ্দীপতি করিতে পারিয়াছিল একমাত্র পদ্মা ও মেঘনার নির্মম ভাঙ্গাগড়া।"

প্রকৃতি ও নিসর্গের দিক দিয়ে পূর্ববঙ্গকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–
(১) উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পর্বতমালা এবং
(২) বিস্মৃত পলিমাটির সমতলভূমি।

১. উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পর্বতমালা

পূর্বে সিলেট ঘিরে বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে উত্তর এবং উত্তর পূর্বে আছে ছোট পাহাড় বা টিলা। উচ্চতায় এগুলো সাধারণত একশো থেকে দুশো ফুট। টিলা আছে কিছু সুরমা এবং কুশিয়ারার মাঝে গোপালগঞ্জ ও মধুগঞ্জের কাছে। কুশিয়ারার দক্ষিণে আছে দু'টি পাহাড়ের সারি যেগুলি সমুদ্র থেকে খুব বেশি হলে আটশো ফুট উঁচু। এগুলো হলো, পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাথারিয়া, বাংলা, রাজকান্দি, কালিমারা, সাতগাঁও এবং রঘুনন্দন। নদী ও প্রশস্ত সমতলভূমির একঘেয়েমিতে বৈচিত্র এনেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কিওক্রিডাংয়ের উচ্চতা ৪০৩৪ ফুট। এ দিকে আছে দশটি পর্বতমালা–বাসিতাং, মারাঙ্গা, কায়ানারাং, বিলাইছড়ি, ভাঙ্গামুরা, বাটি মইন, ধরকল, সিতা-পাহাড় এবং ফটিকছড়ি। এগুলো অধিকাংশই ঘন জঙ্গলে আবৃত, মাঝে মাঝে আছে ছোট ঝর্ণা বা ছরা। চট্টগ্রামের উপকূল ঘিরে আছে সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রনাথ পাহাড়।

বাংলাদেশের পাহাড়ে এবং সমতলভূমিতে বসবাস করে, অনেক ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি। এক সময় এরা উপজাতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন সাধারণের কাছে। তারপর আদিবাসী। সম্প্রতি সরকার সংবিধান সংশোধন করে এদের নামকরণ করেছেন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি। যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেনো বাংলাদেশে বসবাস করলেও জাতি হিসেবে বাঙালিদের থেকে তারা আলাদা। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বা সিলেটের একাংশে বাস করেন বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি। সিলেটের প্রধান গোষ্ঠিগুলো হলো–খাসিয়া, মিথেরি, পাথর এবং ত্রিপুরা। পার্বত্য চট্টগ্রামের আছে মগ,

Android Coding Bd

চাকমা, ত্যাংচাঙ্গা, ত্রিপুরা, শক, মুরং, গারো, খিয়াং বনযোগী, পাংখো এবং খাসি। এ ছাড়া ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর অঞ্চলে আছে গারো এবং সাঁওতাল।

পাহাড়ের জগত আলাদা। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা যেমন তাঁদের বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে তেমনি নদীমাতৃক সমভূমি থেকেও তারা হয়ে পড়েছেন খানিকটা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাই বলে যে পাহাড়ের অধিবাসীরা একেবারে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করেন তা নয়। সমতলভূমির অধিবাসীদের মতই তারা গ্রামের বাসিন্দা। এদের অনেকে গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রীস্টান ধর্ম। যেমন ময়মনসিংহের গারোদের সঙ্গে বাঙালির সংস্কৃতিক পরিচয় অনেক দিনের। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা বাংলার আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলেন। বর্তমানে সমতলভূমির সঙ্গে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি আরো বেশি পরিচিত হচ্ছেন। তবে সমতলভূমিকে ভয়ের চোখে দেখেন পার্বত্য অধিবাসীরা। কারণ সমতলভূমি দ্বারা তারা শোষিত হয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রথমে একটি প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে ধরা হয়েছিলো। তারপর থেকে হয় সমতলবাসীরা নয় পাহাড়িয়ারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কখনো না কখনো অভিযান চালিয়েছে এবং এক সময় সমতলের সঙ্গে এদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে শুধু খাজনা প্রদানের। আবার আলোচ্য সময়ের সমতলের লোকদের তেমন কোনো কৌতূহল ছিলো না পাহাড়ের অধিবাসীদের সম্পর্কে এবং এখনও যে আছে তেমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবেনা। অন্তত সাহিত্যে এর কোনো ছাপ নেই।

ব্রদেল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমুদ্র-তটবর্তী সভ্যতার সঙ্গে পার্বত্যবাসীদের সম্পর্কহীনতার কথা বলেছেন। পাবর্ত্যবাসীরা সবসময় নিজেদের স্বায়ত্তশাসিত দেখেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিলো এবং ব্রিটিশ সরকার কোনো সময় তাদের ওপর খুব বেশি প্রশাসন চাপিয়ে দিতে চায়নি। বলা যেতে পারে, পূর্ববঙ্গে বসবাসরত উপজাতিরা সমতলভূমিকে প্রভাবিত করতে পারেনি কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সমতলভূমি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন– এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

২. সমতল ভূমি

পূর্ববঙ্গের বদ্বীপ সমভূমিকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

ক. পশ্চিম বদ্বীপ সমভূমি (কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের উত্তরাংশ ও খুলনার উত্তরাংশ),

খ. পূর্ব বদ্বীপ সমভূমি (মধ্য ও দক্ষিণ ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ)

গ. বদ্বীপে মোহনা বা সুন্দরবন এবং দক্ষিণ পশ্চিম বরিশাল।

নফিস আহমদ (১৯৫৮) লিখেছেন, যদি ফরিদপুর শহরের উত্তর থেকে সাতক্ষীরার দক্ষিণ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর একটি কাল্পনিক রেখা টানা যায় তা'হলে এই রেখার উত্তর এবং পশ্চিম হবে মৃত ও মৃতপ্রায় নদীর এলাকা। কিন্তু পূর্বে আছে সজীব নদী দ্বারা গড়ে ওঠা অঞ্চল।

পদ্মা, যমুনা এবং মেঘনা পাশে সমতল ভূমি হলো ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, কুমিল্লা এবং সিলেটের কিছু অংশ। আর উত্তরে পুরনো পাললিক এলাকায় পড়ে দিনাজপুরের কিছু অংশ, রংপুর, বগুড়ার কিছু অংশ এবং রাজশাহী।

Android Coding Bd

বাংলাদেশের এই একঘেঁয়ে দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলভূমিতে খানিকটা বৈচিত্র্য এনেছে তিনটি সুস্পষ্ট পুরনো এলাকা। এগুলো হলো– মধুপুর, বরেন্দ্র এবং লালমাই।

মধুপুরের আয়তন প্রায় ষোল হাজার বর্গ মাইল। এলাকার বিস্তৃতি ময়মনসিংহ জেলার কেন্দ্র থেকে ঢাকার উত্তরাংশ পর্যন্ত এবং এ অঞ্চলের মাটি রক্তিম। ময়মনসিংহের উত্তরাংশ, জয়বেদবপুর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর জুড়ে আছে দীর্ঘ গজারির জঙ্গল আর এর ধার ঘেঁষে আছে যমুনা, পুরনো ব্রহ্মপুত্র এবং ধলেশ্বরী।

বরেন্দ্রের আয়তন প্রায় ৩,৬০০ বর্গ মাইল। এই একই পরিমাণ জায়গা এখন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। বরেন্দ্রের অন্তর্গত হলো রংপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ দিনাজপুর, বগুড়ার উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং রাজশাহীর দক্ষিণ পশ্চিমাংশ। মাটি এখানকার হলদে থেকে লাল। এর মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু জলা জংলা আর বিশাল বৃক্ষ।

কুমিল্লার দক্ষিণ পশ্চিমাংশের অল্প কিছু জায়গা লালমাই-র অন্তর্গত। লালমাই পাহাড় নামে এলাকা পরিচিত, যদিও elevation কোথাও ২০ থেকে ৪০ ফুটের উঁচু নয়। মাটি এখানকার রক্তিম।

মানুষ সব সময় সমতলভূমি জয় করতে চেয়েছে, কারণ সমতলভূমির জয় মানুষের আজীবনের স্বপ্ন। কিন্তু বিনা আয়াসেই কি তা সম্ভব? বোধহয় নয়। ব্রদেল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, সমতল ভূমি মানেই প্রাচুর্য, সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্য নয়। এ প্রসঙ্গে 'সোনার বাংলা' কিংবদন্তীর কথা উল্লেখ করতে হয়। এ কিংবদন্তী শুনে সমতল ভূমি সম্পর্কে আমাদের অন্য ধারণা জন্মাতে পারে। কিন্তু এটা ছিলো নিছকই কিংবদন্তী। খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করছি, ইংরেজ সিভিলিয়ানদের রিপোর্ট, বই-পত্র, অনেক ঐতিহাসিকের রচনা বা লোকগাঁথা ইত্যাদি পড়লে মনে হবে, বাঙলার সমতলভূমির সাধারণ মানুষ অর্থাৎ কৃষকরা সুখেই কালাতিপাত করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, উনিশ শতকে ঢাকায় কৃষি বিষয়ক এ ধরনের একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা যায়, রিপোর্টে বলা হয়েছিলো ২৫ বিঘা জমির মালিক এক সম্পন্ন পরিবারের কথা। কিন্তু সরকারী পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করেই দেখেছি ঐ 'সম্পন্ন চাষীর' বাৎসরিক ঘাটতি ছিলো ৩৫ রুপি। সফিউদ্দিন জোয়ারদার রাজশাহীর ওপর এ-ধরনের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ৫ বিঘা জমি আছে এমন কৃষকের বার্ষিক ঘাটতি ১০৬ রুপি। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী সকালে এদের নাস্তা ছিলো ভাতের সঙ্গে বাসি ডাল বা তরকারী অথবা শুধু নুন বা লংকা, দুপুরে ও রাতে ভাত, তরকারী ও ডাল। ডিম বা মুরগি ছিলো বিলাসিতা।

১৯৪৭ সালের আগেও বাংলাদেশের অনেকাংশ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, পতিত। এর আগে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা নানা গ্রামের আশেপাশে কিছু ক্ষেত খামার ছাড়া সমতলভূমির প্রায় অধিকাংশ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ১৮৫০ সালের দিকেও চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা হয়ে ঢাকা যাওয়ার রাস্তা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ।

বাংলাদেশের মানুষকে এই সমতলভূমি জয় করতে অনেক লড়াই করতে হয়েছে।

Android Coding Bd

প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল বন্যা ও মহামারি। জমি উদ্ধার করেই বাঙালি কৃষক বাংলা/বাংলাদেশকে শস্য শ্যামল করে তুলেছিলেন। এখনও তা অব্যাহত।

আমাদের স্বাধীনতার আগেও কয়েকটি বড় শহর ছাড়া, অধিকাংশ জেলা শহর ও বর্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্যে তফাত ছিল কম।

আবহমানকাল থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল এবং সাগরপারের দেশ থেকে ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, আরব, আর্মেনিয়া প্রভৃতি বিদেশীরা এসেছিলেন বাংলাদেশে। বসতি স্থাপন করেছেন কিন্তু কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠেনি।

এ-ছিল এক ধরনের সহ অবস্থান মাত্র। বিদেশীদের সঙ্গে বা জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে সে গ্রাম ছেড়ে চলে এসে অন্য গ্রামে বসতি স্থাপন করেছে। চেয়েছে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে। কিন্তু সে রুখে দাঁড়ায় মাত্র একটি কারণে, যখন তার নিজ জমির উপর কেউ হস্তক্ষেপ করে। কারণ, তার জীবিকার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে জমি।

সরকারী প্রশাসন গ্রামীণ সমাজের ওপর তেমন নিয়ন্ত্রণ কখনও স্থাপন করতে পারেনি। গ্রামীণ সমাজ আত্মমগ্নভাবে নিজ পথেই চলেছে। এক ধরনের প্রশাসনের ভিত্তিতে চলেছে এ সমাজ। ঔপনিবেশিক প্রশাসন যে সমাজকে চূর্ণ করতে চায়নি তেমনভাবে বা পারেনি।

পূর্ববঙ্গের গ্রামে সোজাসাপটা বসতির ধারা কখনও গড়ে ওঠেনি। এর কারণ নদীর অনবরত ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জমিদার জোতদারের অত্যাচার। ফলে কোনো একটি নির্দিষ্ট গ্রামে কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবার বংশানুক্রমে ঘর বেঁধে থাকেনি। সে অনবরত বসতি বদলেছে। কোনো গ্রামে, একাদিক্রমে তিনচার পুরুষ ধরে কেউ একই বসত বাড়িতে বাস করেছে এমন দৃষ্টান্ত খুব কম। পূর্ববঙ্গের গ্রাম-বাসীরা তেমনভাবে শেকড় গেড়ে বসেনি কোথাও।

এ প্রসঙ্গে নিজের কথা উল্লেখ করতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে, এ বিষয়ে নিজের গ্রামে খোঁজ নিয়েছি আমি। তিন পুরুষ আগে, ঐ গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোন অঞ্চল থেকে কিভাবে এলেন সে বিষয়ে কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত পঞ্চাশ বছরে এ পরিবারের বিভিন্ন শাখা মূল গ্রাম ত্যাগ করে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে বসতি বেঁধেছে।

গ্রামের মানুষের জগত সীমাবদ্ধ নিজ গ্রামেই। সেখানে বা গ্রামীণ সমাজে বহিরাগতের কোনো স্থান ছিলো না। গ্রামের প্রায় প্রতিটি লোক বিভিন্ন মেল বন্ধনে আবদ্ধ। গ্রামের বাইরের জগৎ তার কাছে বিদেশ। সে যখন বলে, 'আমি দেশে যাচ্ছি', তার মানে সে নিজ গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। এর প্রভাব দেখি আমরা এ অঞ্চলের পুঁথি সাহিত্যে যেখানে ফ্যান্টাসী, স্বপ্নের এক অদ্ভুত জগৎ তৈরি করা হয়েছে এবং যা এখনও অক্ষুন্ন। এবং এ ধরনের একেকটি আত্মমগ্ন গ্রামে বাস করতেন পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জনসাধারণ।

একটি মাত্র নরগোষ্ঠী থেকে উৎপত্তি হয়নি বাঙালির। কয়েকটি নরগোষ্ঠীর মিলিত ফল বাঙালি। বাঙালির আকার মাঝারি, তবে ঝোঁক খাটোর দিকে, চুল কালো, চোখের

Android CodingBd

মণি হালকা থেকে ঘন বাদামী, গায়ের রংও ঐ [illegible] নাক মাঝারি। বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, আদি অস্ট্রেলীয় বা কোলিডদের দীর্ঘ মুণ্ড, প্রশস্ত নাক, মিশর এশীয় বা মেলানিডদের দীর্ঘ ও মাঝারি নাক এবং দীর্ঘ মুণ্ড ও অ্যালপাইন বা পূর্ব ব্রাকিডদের উন্নত নাক ও গোল মুণ্ডর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে বাংলার জনসমষ্টি। রক্তে মিশ্রণ ঘটেছে নিগ্রোবটু, মোঙ্গলীয় এবং আদি নডিক বা খাঁটি ইণ্ডিডের। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, 'এই বিচিত্র সংকরজন' নিয়েই 'বাঙলার ও বাঙালির ইতিহাসের সূত্রপাত।'

অতি প্রাচীনকালে, এসব নরগোষ্ঠী বাস করেছে কোমবদ্ধ হয়ে এবং একটি কোমের সঙ্গে অপরটির যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। সভ্যতার বিস্তৃতির ফলে, বিভিন্ন কোমের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিলো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিলো বৃহত্তর কোম, যেমন বঙ্গ, রাঢ়া, পুণ্ড্র প্রভৃতি। এই কৌমচেতনা প্রাচীন যুগে তো বটেই, মধ্যযুগেও ছিলো এবং এখনও বহমান।

দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙালিদের প্রধান খাদ্যের অমিল নেই। সমুদ্রশায়ী সমতলভূমির লোকেরা ভাতভূক। পূর্ববঙ্গের জলবায়ু ধান উৎপাদনে বিশেষ সহায়ক তাই ভাতই বাঙ্গালির প্রধান খাদ্য। ভেতো বাঙালি কথাটার উদ্ভব বোধ হয় সেখান থেকেই। যে-সব দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান, ধরে নিতে হবে তা আদি অস্ট্রেলীয় অষ্ট্রিক ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর 'সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান'। এবং এই ভাত ধনী গরীব সবারই প্রধান খাদ্য। আবার ধানকে ভালোবেসে বাঙ্গালি নদীর মতই এর বিভিন্ন নাম দিয়েছে রূপশালী, কাটারীভোগ, বালাম ইত্যাদি।

কথায় বলে, মাছে ভাতে বাঙ্গালি। অর্থাৎ ভাতের পর মাছই তার প্রধান খাদ্য এবং এর একটি কারণ নদীনালা খালবিলে মাছের সহজলভ্যতা। তাছাড়া এটিও অষ্ট্রিক ভাষাভাষি আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতার দান। এই মাছ ধরার কৌশল বা হাতিয়ারের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙ্গালিদের তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

বাঙ্গালিদের পোষাক সাধারণ। উনিশ শতকের প্রায় শেষার্ধ পর্যন্ত সবাই ধুতি বা কাছা দিয়েই কাপড় পরতেন। মেয়েরা পড়তেন একপেচে শাড়ি। ফারাযীরাই প্রথম পূর্ব বাংলায় সাদা লুঙ্গি বা তহবন্দের প্রচলন করেছিলেন। রঙ্গীন লুঙ্গির আমদানী হয়েছিলো বার্মা থেকে। আবুল মনসুর আহমদের আত্মজীবনীতেই প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ফারাযীরা এখানে প্রচলন করেছিলেন সাদা লুঙ্গির। এ ছাড়া প্রাচীন দু'একজনের সঙ্গেও আলাপ করে দেখেছি এবং তারাও এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেননি।

প্রথম দিকে মুসলমানরাই লুঙ্গি পরা শুরু করেছিলেন, কিন্তু অন্তিমে তা হিন্দু-মুসলমান এক কথায় পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালিদের সর্বজনীন পোষাকে পরিণত হয়।

ভাষা কাজ করে দু'ভাবে-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক একক হিসেবে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভাষা একটিই–বাংলা ভাষা। এ ভাষা সাংস্কৃতিক একক হিসেবে কাজ করেছে উভয় বঙ্গেই, কিন্তু রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেছে পূর্ববঙ্গেই। নীচের আলোচনায় আমি তাই দেখাবার চেষ্টা করব।

Android Coding Bd

ভাষার প্রকাশ বিবিধ ঃ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক মতাদর্শগত। পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে যখন থেকে পূর্ববাংলা ঐতিহাসিক পর্যায়ে রাজনৈতিক একটি একক হিসেবে উদ্ভব লাভ করেছে, তখন থেকেই ভাষার মধ্যে দিয়ে, ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার নির্দিষ্ট প্রকাশ হয়েছে সংস্কৃতিতে, সমাজে, মতাদর্শে। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে জনগোষ্ঠীর মৌখিক ব্যবহারে, জীবন ধারণে, মতাদর্শে, প্রবাদে, ছড়ায় এই নির্দিষ্টতা সোচ্চার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই নির্দিষ্টতার অন্যতম উপাদান ভাষার রাজনৈতিক একক হিসেবে ব্যবহার।

প্রাচীনকাল থেকেই অভিজাত এবং শাসকরা এ অঞ্চলে নিজেদের ভাষা চালু করেছিলেন। এভাবে সাধারণ মানুষের ভাষা থেকে শাসক শ্রেণীর ভাষা আলাদা হয়ে গিয়েছিলো যেমন সংস্কৃত, ফরাসী, ইংরেজী এবং কিছুদিন আগে উর্দু (১৯৪৭-৭১)। সাধারণ মানুষ শাসক শ্রেণীর ভাষার বিপরীতে, নিজেদের ভাষার মাধ্যমে সমাজের ঐক্য তৈরি করেছেন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মুগ্ধ হয়েছেন, অর্থনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেছেন (শাসিত জনগোষ্ঠী কিংবা শ্রেণী হিসেবে) এবং ভাষাকে কেন্দ্র করে মতাদর্শ সৃষ্টি করেছেন। এসব বিভিন্ন উপাদান আবার শক্তি যুগিয়েছে। এই অঞ্চলের রাজনীতিতে, সেজন্য ভাষা রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ও মতাদর্শ তৈরির পটভূমি হিসেবে। জাতীয়তাবাদী প্রেমের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জনগোষ্ঠীর মৌখিক রীতি, পুথি পাঠ, পুথি পাঠের সমাজ বিন্যাস, নিম্নবর্ণের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, মধ্যশ্রেণীর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রয়াস– সবকিছুই শাসকশ্রেণীর ভাষার বিপরীতে প্রতিবাদ, বিদ্রোহের বিভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই সমস্যার বিভিন্ন স্তর আমি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করবো।

গ্রীয়ারসন (১৯২৭) বাংলা ভাষাকে দু'টি প্রধান শাখা পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করেছেন। পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার কেন্দ্র হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন ঢাকা জেলাকে। তাঁর মতে, এ অঞ্চলের ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রথমে নজরে পড়ে খুলনা এবং যশোরে। গাঙ্গেয় বদ্বীপের পূর্বেও তা বিদ্যমান। তারপর তা প্রসারিত হয়েছে উত্তর পূর্বে। মাগধী, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের রূপ চারটি– রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বাঙ্গালি ও কামরূপী। বাংলাদেশে প্রচলিত বাঙ্গালি ও বরেন্দ্রী। তবে এই চারটির মধ্যে আবার প্রধান হল রাঢ়ী ও বাঙ্গালি, কারণ ধ্বনিতে, শব্দগঠনে, শব্দভাণ্ডারে এবং বাগরীতিতে এই দুটি ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা এবং এখনও তাই আছে। বরেন্দ্রীর ওপর প্রভাব বেশি বাঙ্গালির।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অঞ্চলভেদে বাংলায় মৌখিক ভাষার নানারূপ আছে। এবং এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উপভাষা। উপ-ভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট থাকে আঞ্চলিক জীবনধারা। তবে ভাষার ক্ষেত্রে পরিশীলনের জন্য নষ্ট হয় আঞ্চলিকতা। ভাষা গড়ে ওঠে একটি কৃত্রিম একক হিসেবে যেখানে ক্রমাগত তৈরি হতে থাকে শাসক-শ্রেণীর আধিপত্যবাদ। উপভাষায় ঐ আধিপত্যবাদের প্রভাব সামান্য এবং তাই এ ক্ষেত্রে টিকে থাকে আঞ্চলিকতা। পূর্ববঙ্গের উপভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃত রীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো সাধুভাষা। আবার

Android Coding Bd

এরই পাশে বর্তমানে গড়ে উঠেছে একটি ভাষা যা কলকাতার শিষ্ট জনের মৌখিক ভাষা।' এর বিপরীতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষার একক বা পূর্ববঙ্গে সকল সম্প্রদায়ের জীবনচর্চায় ছিলো সক্রিয়। বর্তমানেও তা সক্রিয় রাষ্ট্রিক সাহায্যে।

এ ভাবে আমরা দেখি, উভয় বঙ্গের ভাষা এক হওয়া সত্ত্বেও ভাষা ব্যবহারে দু'অঞ্চলের পার্থক্য বিদ্যমান। সতের শতকে পূর্ববঙ্গের কবি আবদুল হাকিম লিখেছিলেন–

"যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুগায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।"

উপরোক্ত পংক্তিগুলিতে ভাষাপ্রীতি থেকেও আরো সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো শ্রেণীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ প্রতিবাদ। ভাষা কাজ করে তখন রাজনৈতিক একক হিসেবে। এ-পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গের কথা ধরা যাক। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর, উর্দু ভাষী শাসক শ্রেণী ও তাদের সহযোগিরা বাংলাভাষার ইসলামীকরণের ওপর জোর দিয়ে সাংস্কৃতিক আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের নবীন সাহিত্যিকরা পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন তাঁদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে। এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বলেছিলেন, 'স্বাধীন পূর্ববাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্বশাখায় সমৃদ্ধ এক সাহিত্য। ...ঐ সাহিত্য হবে মাতৃভাষা বাংলায়।' ১৯৫১ সালে তিনিই আবার বলেছিলেন, 'বাংলা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষাকে পূর্ববঙ্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদই নয় প্রয়োজনবোধে বিদ্রোহ করতে হবে। কেননা এটা পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্যে জেনোসাইড বা গণহত্যার সামিল।' ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী যখন ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়েছিল শাসক শ্রেণী, তখন তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্রকে বলেছিলেন, 'নিজের মাতৃভাষার জন্যে যদি তোমার প্রাণও যেত আমার কোন দুঃখ থাকতো না।' এভাবে দেখি, ভাষা পূর্ববঙ্গে শুধু আর সাংস্কৃতিক একক হিসেবেই থাকে না, রূপান্তরিত হয় রাজনৈতিক এককেও এবং পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে প্রকাশিত এই আশা আকাঙ্ক্ষাও কাজ করেছিলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পিছে। ভাষা আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অবদান তুচ্ছ করার মতো নয়। এবং তাই পরে প্রেরণা যুগিয়েছিলো স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনে। ভাষার প্রতি যে কোনো আক্রমণ পূর্ববঙ্গের জনগণ গ্রহণ করেছেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে। তাই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক–দুই একক বিচার করলেও দেখব বাংলা ভাষা এ-অঞ্চলের জনগণকে বেঁধেছে এক কঠিন বাঁধনে যা ছিন্ন হবার নয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রথম পাতায়ই লেখা হলো– 'প্রজাতন্ত্রের ভাষা হইবে বাংলা'। এ বৈশিষ্ট্যও খুব কম দেশের সংবিধানে আছে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, এমনকী পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিরাও মনে করেন,

Android Coding Bd

এখন বাংলা ভাষার কেন্দ্র বাংলাদেশ এবং সেই কেন্দ্রই অটুট থাকবে। দেশ গঠনে এই ভাষার বোধ প্রবল ভূমিকা পালন করেছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখি, বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি বাংলাকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান বেছে নিয়েছে, দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে। শুধু তাই নয়, বিবিসির জরিপে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে এই রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরই সাধারণ মানুষ স্থান দিয়েছেন তাঁকে।

সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা ধর্মীয় সহনশীলতার বিষয়টি এক সঙ্গেই আলোচনা করা যেতে পারে। ধর্ম ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা ধর্মের বিভিন্ন রিচ্যুয়ালে প্রভাব ফেলেছে।

বাঙালির মনের কেন্দ্রে আছে ধর্ম এবং তা অস্বীকার করার উপায় নেই। হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের জন্যই একথা প্রযোজ্য। এ বোধ থেকে বাঙালি কখনই মুক্তি পায়নি এবং মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্রে তখনতো বটে, এখনও অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রবল ধর্মবোধ।

প্রাচীনকালে তো এ ভূখন্ডে হিন্দু মুসলমান বা বৌদ্ধ ছিল না। ছিল অনার্য, জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধ এবং তারপর বৈদিক প্যাগান ধর্মের আবির্ভাব হয়। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, "প্রাক-আর্য নানা কৌম ধর্ম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের নানা মত, পথ ও অনুষ্ঠান, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম প্রভৃতি নানা আদর্শ ও আচার উচ্চ কোটি ও লোকায়তস্তরের বাঙালি জীবনে প্রচলিত ছিল।"

এ কারণে, এখনও দেখা যায় মাজারের প্রতি হিন্দু মুসলমানের একই বিশ্বাস। তন্তমন্ত্র, কবচ তাবিজে সব বাঙালিরই কম বেশি আস্থা আছে। হিন্দু মুসলমান সবার বিয়ের অনুষ্ঠানেই গায়ে হলুদ, আলপনা আছে। পহেলা বৈশাখের উৎসব জঙ্গিরা বোমা মেরে হত্যা করেও বন্ধ করতে পারেনি। এ হচ্ছে সংস্কৃতির সমন্বয়বাদিতা যার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়।

ধর্ম নিয়ে বাদ-বিবাদও ছিল কিন্তু যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ বা বৈশিষ্ট্য, তা হলো "রাজা বা রাজবংশের ব্যক্তিগত ধর্ম যাই হোক না কেন তাতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ সংস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। অন্তত পান পর্ব পর্যন্ত সে আদর্শ অক্ষুন্ন।" সেন যুগে বৈদিক ধর্মই শক্তিশালী হয়ে ওঠে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মও বলা হয়।

এছাড়া অন্যান্য ধর্মমত যেমন বৈষ্ণব, শক্ত, সৌর, জৈব প্রভৃতির বিকাশ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য থাকলেও সকল সংস্কৃতি/ধর্ম-এর প্রভাব এড়ানো যায়নি অন্তত সাধারণ স্তরে। এর পরে বিকশিত হয় ইসলাম। আবদুল করিম লিখেছেন, "বাংলায় শুধু স্থানীয় উপাদানই ইসলামে প্রবেশ করেনি, স্থানীয় ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাকেও ইসলাম গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।" এনামুল হকের মতে "বঙ্গে ইসলামের স্থায়িত্ব প্রাপ্তির ইতিহাস প্রধানত এই মৌলিক ইসলামেরই ইতিহাস।" সুফিবাদের প্রভাবের কথা সবাই উল্লেখ করেছেন। যে কারণে এ দেশে সাধারণ মানুষ ইসলাম যেভাবে পালন করেন অনেক ইসলামী দেশে সেভাবে তা পালিত হয় না। সব মিলিয়ে এ দেশের ইসলাম

Android Coding Bd

Android Coding Bd

লৌকিক ইসলাম।

আবুল মাল আবদুল মুহিত এ প্রসঙ্গে সহজ করে লিখেছেন, "বাঙালি চরিত্র মোটামুটি ধর্ম নিরপেক্ষ। বাঙালি মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে পাকিস্তানীদের চেয়েও বেশি ধার্মিক কিন্তু তারা ধর্মান্ধ নয়। ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার তারা অপছন্দ করে। বাস্তবে বাংলাদেশের সমাজ অত্যন্ত উদার, সর্বগ্রাহী এবং এক হিসেবে সার্বজনীন।

এমনকি ধর্মীয় আচরণেও এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যাপক লেনদেন করে আসছে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শ সুলতানী আমলের বাংলায় প্রতিষ্ঠা পায় এবং পরবর্তীকালে আরো শক্তি সঞ্চয় করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে যে সমাজ সহস্রাধিক বছরে গড়ে উঠেছে তা বস্তুত পক্ষে সংশ্লেষী (Synthetic) নয়, বরং যৌগিক (syncretic) সামাজিক এই বৈশিষ্ট্যও হয় জাতীয়তার অন্যতম উপাদান।"

বিভিন্ন ধর্মের মিলনস্থান বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবে। এবং সে সব অনুষ্ঠান, রীতিনীতি প্রভাবিত হয়েছে এ দেশের অনার্য সংস্কৃতি দ্বারা। সেটিকেই বলা যেতে পারে বাঙালি মানস যেখানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধের চিন্তাচেতনা এক বা পরস্পর প্রভাবিত বা প্রবিষ্ট।

বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারপরেই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা। তবে প্রায়ই আমরা হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের কথা বলি। সম্প্রতি যে জঙ্গিবাদের উদ্ভব তাও হুমকি সাধারণ মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য।

মুসলমান-হিন্দু দুটি ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় হলেও এরা প্রাক ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তান ঔপনিবেশিক আমলে পাশাপাশিই অবস্থান করেছে। ধর্মবোধ তাদের দুটি বিপরীতমুখী অবস্থান সৃষ্টি করেনি অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রে। বহিরাগত সংস্কারকরা বিশেষ করে ওহাবি সংস্কারকরা ওপর থেকে ইসলামের তত্ত্ব চাপিয়ে দিয়ে সাময়িক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলেও অন্তিমে তা ফেলতে পারেনি। বর্তমানে জঙ্গি মৌলবাদ ওহাবীদেরই নতুন সংস্করণ। দেশের রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রশ্রয় পেলেও সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করেননি। হিন্দু সংস্কারকরা মূলতঃ নিজেদের সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রে বাঙালি পরিচয়টাই প্রাধান্য পেয়েছে বা এই পরিচয়ের ধারাবাহিকতা বিভিন্ন সময় এলিট বা রাষ্ট্র নষ্ট করতে চাইলেও পারেনি। এই বোধের কারণেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বদলে বাঙালিত্বের বিভিন্ন উপাদান রক্ষার ব্যাপারে যৌথ লড়াই হয়েছে। এই উপাদানগুলিকে বরং সমন্বয় ধর্মীয় উপাদান বলা যেতে পারে। আবার এই বোধকে অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতাও বলতে পারেন। তবে ধর্ম সহিষ্ণুতা বলাই বোধহয় শ্রেয় এবং বাঙালির জাতি রাষ্ট্র গঠনে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উপরোক্ত আলোচনায় কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঙ্গা ও বাংলাভাষা দু'টিই সংকর। কিন্তু এই ভাষার ভিত্তিতেই বাংলাদেশের জনসাধারণকে রাজনীতিগতভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা বা সংজ্ঞা দেয়া যায়। এছাড়া পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান,- - এবং বিশেষ করে নদী প্রবাহ উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে একে চিহ্নিত করেছে

Android Coding Bd

আলাদাভাবে এবং নদী প্রবাহই নিয়ন্ত্রণ করে পূর্ববঙ্গবাসীর জীবন, নির্ধারণ করেছে তার চরিত্র। এ ছাড়া জীব চর্যা, শিল্পকলা প্রভৃতি একদিকে যেমন এ অঞ্চলে এক ধরনের ঐক্য সৃষ্টি করেছে তেমনি একে চিহ্নিত করেছে পৃথক সত্তা হিসেবে।

জলবায়ু ও প্রকৃতি বাংলাদেশবাসীকে কিছুটা আয়েসি করে তুললেও নদী ও সমুদ্র তাকে দিয়েছে আত্মরক্ষার সহজ প্রবণতা ও প্রতিরোধক্ষমতা এবং তার মনে সৃষ্টি করেছে এক ধরনের ভাবালুতা।

রাধাকমল মুখার্জী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বাঙালির এই রক্ত সংমিশ্রণ তাহার প্রধান গৌরব। ইহা হইতেই আসিয়াছে বাঙালির কোমলতা ও ঔদার্য।...তাহা ছাড়া বাঙ্গালার মাটির, বাঙ্গালার জলের, প্রতিবেশের প্রভাব খুব প্রত্যক্ষ, খুব নিবিড়। ...বাঙালি তাই সবক্ষেত্রে ভাবুক, উদার ও সেরা বিদ্রোহী। তাই আর্য্য সংস্কৃতি ও বেদ বিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাঙ্গালাতে প্রথম ও প্রধান আশ্রয় পাইয়াছিল।" কিন্তু উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এও বলতে পারি যে, পূর্ববঙ্গবাসীদের মনে দু'টি পরস্পর বিরোধী সত্তার জন্ম হয়েছিলো।

ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণ এ-অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মানসিকতা তৈরি করেছে। নদীর অনবরত ভাঙন, মহামারী, অত্যাচার ইত্যাদির ফলে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ সব সময় বসতি বদলেছে। এই জায়গায় সে শেকড় গাড়তে পারেনি দৃঢ়ভাবে। সমাজের মেলবন্ধন শক্ত হতে পারেনি, তার দরুণ ব্যক্তি প্রবণতা শক্তিশালী হয়েছে। ফলে তার চরিত্রে সৃষ্টি হয়েছে নৈরাজ্যের।

আবহমানকাল থেকে বিদেশীরা এখানে এসেছে কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসীর জন্য তা কখনও বড় রকমের সমস্যার সৃষ্টি করেনি। শাসক বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও এক ধরনের সহ-অবস্থান ছিলো তাদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গবাসীর। কিন্তু যখন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তখন সরাসরি কোনো সংঘাত বা সংঘর্ষের পরিবর্তে সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে বা বসতি বদলেছে। ফলে সব কিছুকে এড়িয়ে যাওয়ার, কোনো কিছুর দায়িত্ব না নেয়ার এক ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছে তার মনে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গে এতো কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিলো কিভাবে? এটা ঠিক পূর্ববঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ করেছিলো কিন্তু যতক্ষণ সম্ভব সে সংঘাত এড়িয়ে চলেছে। সে রুখে দাঁড়িয়েছে তখন যখন অত্যাচার একেবারে চরমে উঠেছে বা তার জীবিকার অবলম্বন জমির উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ঐ একটি কারণে এখনও বাঙালি রুখে দাঁড়ায়। এভাবে আমরা দেখি পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর মধ্যে দু'টি পরস্পর বিরোধী সত্তার জন্ম হয়েছে। নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছিলেন, উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে ও বাঙ্গালির বাস্তব সভ্যতার রূপ গ্রামীণ। কথাটি সর্বাংশে সত্য। আলোচ্য সময়ে দেখি, পূর্ববঙ্গে ছিলো তখন জলাজঙ্গল পরিস্কার করে আবাদ করার সময়। শহর যেগুলো ছিলো সেগুলো ছিলো যেন সমৃদ্ধিশালী গ্রামেরই বিস্তৃতি। গ্রামের সঙ্গে 'শহর-বাসীর' সম্পর্ক ছিলো অতি ঘনিষ্ঠ, দৃঢ়। বিশ শতকের দ্বিতীয়/তৃতীয় দশকেও দেখি আধুনিক উপন্যাসের শিক্ষিত নায়ক পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলছে,

Android Coding Bd

পৃথিবীর সব মানুষ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের গ্রামের টোলপাঠশালায় মান্ধাতা আমলের কেতাব পড়ানো হচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী যখন যন্ত্রশিল্পের যুগ আরম্ভ হয়েছে তখন গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু জমিদাররা ভাসান গান বা কথকতা নিয়ে ব্যস্ত। 'নিতান্ত গ্রাম্য মানুষের গ্রাম্য সভ্যতা আমাদের। পূর্ব বাঙ্গালায় তাহার উপকরণ দৈন্য ছিল আরও সুস্পষ্ট প্রায় প্রিমিটিভ।' (গোপাল হালদার, 'স্রোতের দীপ')। এর একটি প্রধান কারণ, সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় ধরে এ অঞ্চলের উৎপাদন পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

কেন্দ্র থেকে পূর্ববঙ্গের অবস্থান ছিলো সব সময় দূরে। কেন্দ্রে শাসন করেছে বিদেশীরা। ফলে প্রত্যক্ষভাবে গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়নি। পূর্ববঙ্গবাসী তার কৃষি ও গ্রামীণ সভ্যতার মধ্যে আবর্তিত ছিলো! এক ধরনের চলনসই প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিলো মাত্র তাদের ওপরে। সে কারণেই তারা কখনও বেশি প্রশাসনিক বাগাড়ম্বর বা প্রশাসন সহ্য করতে পারেনি। ঔপনিবেশিক কারণে পূর্ববাংলার সমাজ গঠনে শ্রেণীবিন্যাস তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু সমাজবন্ধন শিথিল হয়নি। ফলে শ্রেণীবিন্যাসের বিপরীতে সামাজিক মেলবন্ধন লাভ করেছে অতিরিক্ত প্রাধান্য। একজন ব্যক্তি, একই সঙ্গে সমাজ ও শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত কিন্তু যুক্ততার আধিক্য সমাজের দিকেই বেশি। সেজন্যে সমাজের মধ্যে শ্রেণী সম্পর্ক নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, যখনই সেই ব্যক্তিটি বিভিন্ন জাতি, গ্রাম ও সমাজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তার দরুণ কখনও কখনও শ্রেণীবিরোধ তৈরি হলেও তা সামাজিক মেলবন্ধনে সম্পূর্ণ ভাঙন ধরাতে সক্ষম হয়নি।

পূর্ববঙ্গবাসীর মধ্যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিলো এবং আছে। কিন্তু এর কারণ, এখানকার কৃষিভিত্তিকতা যেখানে উৎপাদন পদ্ধতি প্রায় নিশ্চল। এই নিশ্চলতার দরুণ সমাজবিন্যাসে বহু স্তর সমান্তরালভাবে থেকে গেছে। এছাড়া কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থান এবং প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা আবার সৃষ্টি করেছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সাংস্কৃতিক অসাম্যের। আর নিশ্চল উৎপাদন পদ্ধতি তাকে আরো জোরদার করে তুলেছে সৃষ্টি করেছে গতিহীনতা ও পুনরাবৃত্তির। আবার 'সমাজ কাঠামোর' অসম ঐক্য সংস্কৃতি প্রসারণের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে, সে জন্য আঞ্চলিকতা বাংলার গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে থেকে গেছে।

"বাঙালি সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিলো অষ্ট্রিক দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব ও মনন। বাঙালির মননেও অধ্যাত্ম বুদ্ধি, সংখ্যা, যোগতন্ত্রের প্রভাব বারবার প্রবল রয়েছে।" এখনও দেখেছি চট্টগ্রামের বায়েজীদ বোস্তামীর দরগায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে গাছে সুতো বেঁধে মানত করছে। এখনও বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান পঞ্জিকা ঝাড়-ফুক ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। কিন্তু এর প্রধান কারণ সেই উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতা। বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন যেমন হয়েছে ঐখানে তেমনি আবার "উৎপাদন পদ্ধতির নিশ্চলতার দরুণ ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্ব বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান মতবাদ প্রয়াস ও দার্শনিক মনোভঙ্গি স্বতন্ত্র করে রেখেছে।"

Android Coding Bd

উনিশ শতকে সম্পূর্ণভাবে কৃষিভিত্তিক পূর্ববঙ্গ পরিণত হয়েছিলো কাঁচামালের আড়ত হিসেবে। জনৈক ইংরেজ কর্মচারী লিখেছিলেন, পূর্ববঙ্গ ভারত সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও ভালো প্রশাসন এর সীমানায় থেমে গেছে। ঐতিহ্য মতই একে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রশাসনিক দিক থেকে উপেক্ষিত হলেও কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে একে উপেক্ষা করা হয়নি। উনিশ শতকে দেখি পূর্ববঙ্গ পরিণত হয়েছিলো কলকাতা তথা বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কাঁচামালের আড়ত বা পশ্চাদভূমি হিসেবে। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় শাসক শোষক পূর্ববঙ্গকে দেখেছে পশ্চাদভূমি হিসেবে এবং এই অবস্থা চলেছে ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গ (বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

সহায়ক গ্রন্থ

নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব*, কলকাতা, ১৯৮০।
গোপাল হালদার সম্পাদিত *সোনার বাংলা*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৯৫৬।
প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ, *বাঙালি*, কলকাতা, ১৯৬৩।
রাধাকমল মুখার্জি, *বিশাল বাঙ্গালা*, কলকাতা, ১৩৫২।
আহমদ শরীফ : *বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৭৮।
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, *বাংলা ভাষা*, কলকাতা, ১৯৭৬।
রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ২০০২
আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত), ঢাকা, ১৯৯৩।
আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, ২০০০।
হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্র চিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা, ২০০৩।
মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা, ২০১৩ (চতুর্থ সং)।
মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ : বাঙালি মানস, রাষ্ট্র গঠন ও আধুনিকতা*, ঢাকা।
সালাহউদ্দিন আহমেদ, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, ১৯৯২

প্রবন্ধ

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাংলার মুসলমান', *সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৪
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি' *স্বদেশ ও সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৯
অসীম রায়, *'মুসলিম বাংলার ইতিহাসে সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির ভূমিকা'*,
সালাহউদ্দিন আহমদ প্রমুখ সম্পাদিত, *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, ১৯৯১
সফিউদ্দিন জোয়ারদার, *'ইসলাম ও আধুনিকতা ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা,*
সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ সম্পাদিত, *আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা-১৯৯১।
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা, *পাক্ষিক জনকণ্ঠ*, ঈদ সংখ্যা, ২০০৩।